যায়যায়দিন
তারিখ ... 18-APR-2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

শিক্ষা ক্ষেত্রে সোশাল বিজনেস

আখতারুজ্জামান ভূইয়া

দারিদ্র্য বিমোচনের নতুন একটি স্বপ্ন বাস্তবায়নের পদ্ধতির কথা আমাদের জানিয়েছেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। পদ্ধতিটি হচ্ছে সোশাল বিজনেস। সোশাল বিজনেসের রূপরেখার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'এটি এমন এক ধরনের ব্যবসা, যেখানে বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করতে পারবেন কিন্তু মুনাফা তাদের দেয়া হবে না। মুনাফা পাবেন গ্রামের দরিদ্র মহিলারা'। (দৈনিক যায়যায়দিন, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭)

'দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্বের জন্য' শিরোনামে একটি লেখায় সামাজিক বাণিজ্যের ধারণা দিতে গিয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূস লিখেছেন, 'সামাজিক ব্যবসার উদ্যোক্তারা তাদের বিনিয়োগ ফেরত নিতে পারবেন কিন্তু কম্পানি থেকে কোনো মুনাফা নিতে পারবেন না। মুনাফা কম্পানির কর্মপরিধি বাড়াতে পণ্য বা সেবার মান উন্নয়নের কাজে লাগবে। সামাজিক ব্যবসা হবে না-ক্ষতি, না-লাভের একটি কম্পানি।'

সামাজিক ব্যবসা সংক্রান্ত এ ধারণা আমাদের দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ধারণাটির বাস্তবায়ন ঘটাতে হলে জরুরি প্রয়োজন এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা। সোশাল বিজনেসে উৎসাহী যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা যাতে সহজেই সোশাল বিজনেসে জড়িত হতে এবং Social Business Professional হিসেবে নিজের পেশা বেছে নিতে পারে এ সংক্রান্ত আইন দরকার। সর্বপ্রথম এক্ষেত্রে প্রয়োজন সোশাল বিজনেস সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন। এ নীতিমালার আওতায় প্রতিটি সোশাল বিজনেস এন্টারপ্রাইজ নিবন্ধিত হবে।

সোশাল বিজনেস কিভাবে শুরু করা যায় এ ব্যাপারে ড. ইউনূস একটি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

সোশাল বিজনেসে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে 'সোশাল বিজনেস ধারণা' নিয়ে একটি Design Competition করা। স্থানীয়ভাবে, আঞ্চলিকভাবে কিংবা বিশ্বব্যাপী এ প্রতিযোগিতা হতে পারে। এর মাধ্যমে নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা সংবলিত সোশাল বিজনেস এন্টারপ্রাইজ বের করে নিয়ে আসা। যারা প্রকৃত অর্থেই সামাজিক ব্যবসা করবে এবং সমাজে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখবে।

তবে এ রকম সোশাল বিজনেস যদি পুরোপুরি সরকারি নিয়ন্ত্রণহীন হয় তবে এর অপব্যবহার হতে পারে। আবার সরকারি নিয়ন্ত্রণ যদি কঠিন-কঠোর হয় তাহলে অন্যান্য সেক্টরের মতো দুর্নীতি এ ধারণাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেধে ফেলবে। তখন কঠিন কঠোর সমালোচনায় বিদ্ধ হয়ে ড. ইউনূসের যুগান্তকারী ধারণাটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। তাই ড. ইউনূসের সোশাল বিজনেস ধারণা প্রাথমিকভাবে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করে আমরা সহজেই এর বাস্তবায়ন ঘটাতে পারি।

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ সার্টিফিকেট নির্ভর। কিন্তু আমাদের সমাজ একজন সার্টিফিকেটধারী শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কেননা আমাদের চাকরির সংস্থান সীমিত। নিত্য নতুন চাকরির বাজার সৃষ্টি করতে না পারলে চাকরির নিশ্চয়তাও দেয়া সম্ভব নয়। তাই সমাজে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এতে করে সামাজিক অস্থিরতাও বাড়ে।

কিন্তু আমরা যদি সার্টিফিকেট অর্জনের পাশাপাশি একজন শিক্ষার্থীকে যদি পাঠের অংশ হিসেবে মাইক্রো সোশাল বিজনেসের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করি তাহলে আপনাআপনিই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। শুধু প্রয়োজন শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান পদ্ধতিটিকে পরিকল্পনামতো ঢেলে সাজানো।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় 'ব্যবসায় শিক্ষা' শাখায় নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে 'ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা' নামে একটি পাঠ্যবই আছে। এসএসসি কিংবা এইচএসসি পাস করে আর পড়াশোনা করতে না পারলেও যাতে ব্যবসায় শিক্ষার্থীরা ছোটখাটো একটি ব্যবসায়ের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে পারে, এই সুদূরপ্রসারী চিন্তা থেকেই মনে হয় বিষয়টি 'ব্যবসায় শিক্ষা শাখার' পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ধারণাটিকে ভবিষ্যৎমুখী না রেখে যদি বর্তমানমুখী করা যেতো তাহলে শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা যেতো। লোকাল কারিকুলামের আওতায় এ বিষয়ের শিক্ষার্থীরা শিক্ষারত অবস্থায়ই উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠবে।

বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রম বৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন' করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। এই অনুচ্ছেদের 'ক' উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করবে সরকার। আর ১৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা আছে। ১৭ অনুচ্ছেদের 'ক' উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সব বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য' রাষ্ট্র কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা আছে।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সংবিধানে উল্লিখিত এ অনুচ্ছেদ উপ-অনুচ্ছেদগুলো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন সরকারের, নীতি নির্ধারকদের হাতে পড়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে গোজামিলের শিক্ষা নীতিই কেবল প্রণীত হয়েছে। একেক সরকার শিক্ষাকে গিনিপিগ করে কাটাছেড়া করেছে কিন্তু শিক্ষাকে বাস্তবসম্মত এবং উৎপাদনমুখী করে গড়ে তুলতে পারেনি। এ কারণে শিক্ষা দেশের বৃহত্তর সাধারণ মানুষের কাছে একটি দুর্লভ বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে।

কিছুদিন আগে সরকার একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে গিয়ে একটি বড় রকমের ধাক্কা খেয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এটি হতে পারতো একটি যুগান্তকারী শিক্ষা ব্যবস্থা। কিন্তু যারা এই শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হবে সেই জনগোষ্ঠীর ওপর ব্যাপক কোনো গবেষণা না করে বিদেশ থেকে ধার করা নীতি এনে এর বাস্তবায়ন প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু দেশব্যাপী একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধিতার কারণে সরকার এর বাস্তবায়ন থেকে পিছু হটে এসেছে। এটি এখন হিমাগারে আছে এবং আমরা ধরে নিতে পারি এটির অপমৃত্যু ঘটেছে।

আমাদের মূল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এমন জটিলতা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে যে, হুট করে কোনো একটা শিক্ষা ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে জট ছোটানো সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি পরিপূর্ণ ভিশন দাড় করানো। শিক্ষাকে দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার করার পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এগুতে পারি। স্বল্পমেয়াদি একেকটি মিশন হাতে নেয়া যেতে পারে। ছোট ছোট প্রকল্পের মাধ্যমে মিশন বাস্তবায়িত হবে। ভিশন হবে আরো সুদূরপ্রসারী। শিক্ষার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত হয়ে ভিশন বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত এই মিশন চলতেই থাকবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে কোনো সংস্কার করতে হলেই আমরা ছুটে যাই বিদেশে কোনো নীতি ধার করে নিয়ে আসার জন্য। বিদেশ থেকে ধার করা একটি ধারণা আমাদের দেশে সফল নাও হতে পারে। আমাদের দেশের শিক্ষানীতি নির্ধারিত হবে আমাদের দেশের চাহিদা অনুযায়ীই। আমাদের সীমিত সম্পদ, সুযোগ-সুবিধা, জনশক্তি ইত্যাদি দিয়েই আমরা আমাদের শিক্ষানীতি বাস্তবসম্মত করে তুলতে পারি। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে ফাক আছে তা পূরণ করতে হবে আমাদের দেশীয় পদ্ধতিতে, আমাদের দেশীয় যোগান দ্বারা।

ধরা যাক ঢাকার একটি রাস্তা ফাক হয়ে দুই ভাগ হয়ে আছে। এটিকে ভরাট করতে হলে প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা ঢাকা থেকেই করতে হবে। চট্টগ্রাম বা রাজশাহী থেকে মাটি বা লোকবল এনে তা ভরাট করা যেমন ব্যয়বহুল তেমনি সময়সাপেক্ষ। চট্টগ্রাম বা রাজশাহীর মাটি ঢাকার মাটির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নাও যেতে পারে।

বিষয়টি অনেকটা এ রকম। শিক্ষা ক্ষেত্রে ফাকফোকর বন্ধ করতে হলে আমাদের সীমিত সম্পদ-সম্পত্তি এবং চাহিদাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। বিদেশি কোনো নীতি, যা ওই দেশের সার্বিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তা আমাদের দেশের জন্য মঙ্গলজনক নাও হতে পারে। এজন্য আমাদের দেশীয় শিক্ষা নীতিতে কোনো পরিবর্তন আনতে হলে প্রয়োজন আমাদের প্রয়োজনের নিরিখে বাস্তবসম্মত কোনো শিক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে লোকাল কারিকুলাম ধারণার প্রবর্তন শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়ে আসতে পারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

akhterbw@yahoo.com